ডারউইন ও দস্তয়ভস্কি

লাদিস্লাভ কোভাচ

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে চার্লস ডারউইন (১৯০৮-১৮৮২) ও ফিওদোর দস্তয়ভস্কি (১৮২১-১৮৮১) মানুষ সম্পর্কে তাদের গবেষণার বিবরণ প্রকাশ করেন। ডারউইন কাজটি করেন তাঁর ১৮৭১ সালে প্রকাশিত *দ্য ডিসেন্ট অব ম্যান* বইয়ের মাধ্যমে। একই বিষয়ে দস্তয়বস্কি প্রকাশ করেন *দ্য ব্রাদার্স কারামোজাভ*। বইয়ের *দ্য গ্র্যান্ড ইনকুইজটর* রূপক গল্পে বিষয়টি উঠে আসে। গত বছর আমরা ডারউইন বর্ষ পালন করেছি। জীববিজ্ঞানীদের জন্যে ২০১০ হতে পারে দস্তয়ভস্কি বর্ষ। সালটি দস্তয়ভস্কির বইটির ১৩০তম বর্ষ।

দস্তয়ভস্কি ডারউইনের মতবাদের কথা জানতেন। তিনি ডারউইনের “বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি” কথাটি মেনে নিতে রাজি ছিলেন। একজন গোঁড়া খৃষ্টান হওয়াতে তিনি তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেন ধর্মীয় ভাষায়: “মানুষের উৎপত্তি কীসে সেটার আসলে কোনো গুরুত্ব নেই। বাইবেলে বলা নেই ঈশ্বর তাকে মাটি থেকে কীভাবে আকৃতি দিয়েছেন বা কীভাবে পাথর খোদাই করে বানিয়েছেন।“ তবুও তিনি মানুষ ও অন্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য দেখেছেন। মানুষের একটি আত্মা আছে।

দার্শনিক নিকোলাই বেরদায়েভ মন্তব্য করেন, “দস্তয়ভস্কি কিছুই লুকাননি। এ কারণেই তিনি চমকপ্রদ সব আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাঁর গল্পের নায়কের মাধ্যমে তিনি নিজের নিয়তি তুলে ধরেন। নায়কের কথার মাধ্যমে নিজের সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেন। তাদের অপরাধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বলেন নিজের গোপন অপরাধ চেতনা।“

দ্য গ্র্যান্ড ইনকুইজটরকে বলা চলে মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দস্তয়ভস্কির গবেষণার ফল। গল্পে যীশু খৃষ্ট ইনকুইজশনের সময় পৃথিবী ভ্রমণ করেন। গির্জা তাঁকে গ্রেফতার করে ও মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। গ্র্যান্ড ইনকুইজিটর মানব প্রকৃতি সম্পর্কে যীশুর ধারণা সম্পর্কে বিতর্ক করতে জেলখানায় তাঁর কাছে আসেন। ইনকুইজিটরের মতে মানুষকে সুখে রাখার জন্যে শাসন করতে হবে। আর যীশু মানুষকে যে মুক্তির বাণী শোনাচ্ছেন তা মানুষকে দুর্ভোগ ও নিরানন্দের দিকে ঠেলে দেবে। মানুষ সম্পর্কে দুই ধরনের মতবাদকে দস্তয়ভস্কি যেভাবে উপরিস্থাপন করেছেন তা পরিপূরকতা নীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। এ নীতির মাধ্যমে নিলস বোর কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার কণা-তরঙ্গ দ্বৈততার ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন।

দস্তয়সস্কির চোখে মানুষ জটিল, বৈপরিত্যধর্মী ও অসঙ্গতিপূর্ণ প্রাণী। মানুষ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে দেখে বোঝা হিসেবে। এর জন্যে বিনিময় দিতেও রাজি তারা। খৃষ্টের কাছে ব্যাখ্যা করার সময় গ্র্যান্ড ইনকুইজরটর বলেন, “অলৌকিক, রহস্য ও কতৃত্ব।“ আরও বলেন, “শুধু বেঁচে থাকার কৌশল জেনে মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। জানতে চায়, কেন বাঁচতে হবে?”আমরা হয়ত বলতে পারি, এই গুণগুলো হোমো স্যাপিয়েন্সকে ধার্মিক প্রজাতি বানিয়ে দেয়। এখানে ধার্মিক বলতে অনেক বা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বোঝানো হচ্ছে না। বরং ল্যাটিন শব্দ *রেলিগেয়ার* যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা। যার অর্থ বন্ধনে আবদ্ধ করা, যুক্ত করা বা আলিঙ্গন করা। মানুষ রূপকথা খুব পছন্দ করে। এর কারণ হলো তারা ইচ্ছা ও লক্ষ্যের মাধ্যমে সব ঘটনার পূর্ণ ব্যাখ্যা খোঁজে।

কল্পনার স্নায়ুগত ভিত্তির গবেষণা, সীমাতিক্রম, রূপকতা, শিল্প ও ধর্ম এবং নৈতিক আচরণ ও বিচার (ট্রিম্বল, ২০০৭) দস্তয়ভস্কির মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি মস্তিষ্কের সেই অঞ্চলটি শনাক্ত করেছে, যাকে ঈশ্বর অংশ বা ঈশ্বর বিন্দু বলা হয় (অ্যালপার, ২০০১)। এ অঞ্চলগুলো বিবর্তনমূলক জটিলতার নতুন একটি স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি শুধু মানব প্রজাতির মধ্যেই দেখা যায়। এগুলোর মানসিক অনুবাদকে ডারউইনীয় আত্মা বলা যেতে পারে। যা তাদের জড় উপস্তরে সংরক্ষিত। যা অমরও নয়, মহাজাগতিকও নয়। সজ্ঞানতা বা সচেতনতা ও ইচ্ছাশক্তি স্নায়ুবিজ্ঞানের যৌক্তিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে (বার্স, ২০০৩)। এ কারণে ডারউইনীয় আত্মা ও এর সাথে এর আধ্যাত্মিকতা বৈজ্ঞানির গবেষণার জন্যে উপযুক্ত বলে মনে হয়। উদ্দেশ্যের সন্ধান, তুলনা তৈরি ও অনুধাবন, সত্যের ত্রিত্ববাদের অভিজ্ঞতা, ভালো ও সুন্দর, জটিল অনুভূতির সক্ষমতা—যাকে ইমানুয়েল কান্ট বলেছেন মহিমা, রসিকতা ও নাটকের শিহরণ, আত্মনিবিষ্টিতার ক্ষমতা এবং অপরিসীম ভালোবাসা বা ঘৃণার মতো বোকামী। সেকুলারাইজেশন বা ইহজাগতিকীকরণ আধ্যাত্মিকতার পরিকাঠামোকে মুছে ফেলে না। বরং দেখতে সামান্য আকারে হলেও এর প্রতিফলন মেলে বিনোদন শিল্পের প্রসারের মধ্যে। এছাড়াও মৃদুভাবে হলেও বৈশ্বিক মাত্রার আধ্যাত্মিক সংঘাতের মধ্যেও এর দেখা মেলে।

মানবাত্মা সম্পর্কে দস্তয়ভস্কির মত হয়ত আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের মতের সাথেই বেশি মেলে। রাসেল বিশ্বাস করতেন, অজানা কোনো শক্তি বিবর্তনকে উন্নত সংঘবদ্ধতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এই শক্তিকে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র বলতে পারি (শর্মা ও অনিলা, ২০০৭)। বিবর্তন ঘটা সিস্টেমগুলোকে ক্রমেই সাম্যাবস্থা থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় সূত্রটি শেষ পর্যন্ত স্নায়ুবীয় ঈশ্বরের স্রষ্টায় পরিণত হয়েছে।

*দ্য গ্র্যান্ড ইনকুইজিটর* রূপক গল্পে খৃষ্টকে মানবিক জগতের বাইরের সত্যের প্রতীক হিসেবে দেখা যেতে পারে। তিনি তাঁর সঙ্গী কথকের বক্তব্য ও প্রশ্ন শুনছিলেন। কিন্তু নিজে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

একইভাবে মানুষ মহাবিশ্বকে প্রশ্ন ও পূর্বাভাস দিচ্ছে। কিন্তু মহাবিশ্ব নীরব থাকছে। বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা খুব সামান্য আকারে জ্ঞান বৃদ্ধি করছি। আমাদের মস্তিষ্কের অসন্তুষ্ট ও অধৈর্য্য ঈশ্বর অংশ দেরি না করে পবিত্র ধর্মগ্রন্থে সংরক্ষিত পূর্ণাঙ্গ সত্য তুলে ধরছে। অন্তত তিনটি বইয়ের ক্ষেত্রে দাবি করা হয়, সেগুলোতে ঐশী ও সে কারণে প্রশ্নাতীত সত্য রয়েছে: ইহুদিদের তাওরাত, খৃষ্টানদের বাইবেল ও মুসলমানদের কুরআন। জীববিজ্ঞানের ভূকেন্দ্রিকতার অন্ধবিশ্বাস থেকে হয়ত আরেকটি ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়। সেটা হলো জিনোমের মধ্যে ডিএনএ ক্রম।

দস্তয়ভস্কির রেখে যাওয়া কাজ জাতিসংঘ সনদে একটি সংশোধনী প্রস্তাব করছে। আমরা, সংঘবদ্ধ মানবজাতি, গভীর শ্রদ্ধার সাথে ঘোষণা করছি: আমাদের কাছে কখনও কোনো সত্য অবতীর্ণ হয়নি। আমরা আমাদের স্বতন্ত্র অনুসন্ধান ও ভুল করে যাওয়ার মধ্যে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু থাকব।